ইউনিট ১০

নদ নদী

পাঠ-১০.১ ঃ বাংলাদেশের নদী - গতি পথ, প্রধান নদী, উপনদী, শাখানদী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের নদীর গতিপথ, প্রধান নদী, উপনদী ও শাখা নদী সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ বাংলাদেশে নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব বলতে পারবেন।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ (চিত্র-১০.১) বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা নিয়ে নানা মত রয়েছে। কেউবা এই সংখ্যা ২২৫ টি (যার মধ্যে ১০৮ টি উপনদী এবং ১১৭ টি শাখা নদী), কেউবা ২৩৫ টি, কেউবা ৩০০-এর কাছাকাছি আবার কেউবা ১৭৮ টি বলে উল্লেখ করেছেন (মৃধা ২০০০)। তবে অনুমান ও হিসাব কষে বাংলাদেশে ৭০০ নদী আছে বলে বিশেষজ্ঞরা বলেন এবং এই নদী সমূহের মোট দৈর্ঘ্য ২৪,৯৪০ কিলোমিটার (বি.বি.এস, বাংলা পিডিয়া, সিডি ভলিউম -১) বাংলাদেশের নদীনালাকে চারটি নদী প্রণালীতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(১) গঙ্গা নদী প্রণালী

(২) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী প্রণালী

(৩ মেঘনা নদী প্রণালী

(৪) দক্ষিণ-পূর্বাংশের নদী প্রণালী।

আবার এই নদী প্রণালীর মাঝে মোট ৩১ টি প্রধান নদী রয়েছে (বাংলা পিডিয়া, ২০০৪ এবং মৃধা, ২০০০)।

বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা কত?

বিভাগ	শাখা নদীর সংখ্যা	উপনদীর সংখ্যা	মোট
ঢাকা	১৮	২৪	৪২
চট্টগ্রাম	২৭	১২	৪৯
রাজশাহী	১৪	৩২	৪৬
খুলনা	৫৮	২০	৭৮
মোট	১১৭	৮৮	২১৫

উৎসঃ বি.বি.এস.

চিত্র ১০.১ ঃ বাংলাদেশের নদীর গতিপথ

১০.১.১ প্রধান চারটি নদী

১। পদ্মা (গঙ্গা) ঃ বাংলাদেশের প্রধান নদী। ভারতের মধ্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি। রাজশাহীর কাছে কুষ্টিয়ার উত্তর প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর গোয়ালন্দে যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর তিন নদীর মিলিত স্রোত বঙ্গোপসাগরে ঢুকেছে।

শাখা নদী ঃ মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মাথাভাঙা, কুমার, কপোতাক্ষ, শিবসা, পশুর (বা পসুর) বড়াল প্রধান। তা ছাড়া গজারিয়া, পরলিয়া, কাতলি, আত্রাই, আঠারবাঁকী, ব্যাং, নবগঙ্গা, চন্দনা, বানকানা, কালীগঙ্গা, মুচিখালি, মারুফ, চিত্রা, মাশুয়ার খাল, সালক্ষী, ইছামতী, যমুনা, ফটকী, বারাসিয়া, হরিহর-এই নদীগুলো যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুড়া অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। ফরিদপুর ও কুষ্টিয়ার পদ্মার শাখা নদীগুলি: গড়াই, বড় গাংদিয়াদহ, আমলাসদরপুর, ডাকোয়া, মরা, বারাসিয়া, পালং মরাপদ্মা, নবগঙ্গা, ইত্যাদি। বরিশাল এলাকার নদীগুলো হচ্ছে ঃ নয়াভাঙনা, তুর্কি বা পালরদি, ইলিশ তেতুলিয়া, বিষখালি, কীর্তনখোলা, শাহবাজপুর, আড়িয়াল খাঁ, কচাখালি, মধুমতী, হরিণঘাটা, আঁধারমানিক, বারনাবাদ বা পটুয়া, বুড়া গৌরাঙ্গ, আগুনমুখ, লোহালিয়া, বাকেরগঞ্জ, বুড়েশ্বর, আমতলা, ধানসিঁড়ি, সুগঙ্গা, ভোলা, ঝালকাঠি, চালনা, এলেংখালি, নলচিঠি ইত্যাদি।

উপনদী ঃ মহানন্দা, ট্যাঙ্গন, পুনর্ভবা, নগর, কুলিক।

২। মেঘনা ঃ ভারতের নাগা-মনিপুর ইলবিভাঙ্গিকার দক্ষিণ ঢালে উৎপন্ন বরাক নদী সিলেট সীমান্তে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে ছাতক, সিলেট ও সুনামগঞ্জের উপর দিয়ে ধীর ও সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছে। দক্ষিণের থানা মনু মুখের কাছে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা ভৈরব বাজারে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম হয়ে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

উপনদী ঃ ব্রহ্মপুত্র, গোমতী, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, ডাকাতিয়া।

৩। যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ঃ হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের একটি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তারপর তিব্বত ও আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ রংপুর অঞ্চলের কুড়িগ্রামের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে এটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি যমুনা নামে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অপর শাখা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবের নিকট মেঘনায় পতিত হয়েছে। জানা যায়, দুইশত বৎসর আগে এটিই ব্রহ্মপুত্রের মূল গতিধারা ছিল।

উপনদী ঃ তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, কালজানি, তোরসা, জলঢাকা, নাগর, দুপচাপিয়া, যমুনেশ্বরী, রায়ঢাক, ধবলা, ঘাঘট, বাঙালি, বড়াল, গঙ্গা, নারদ নদ, ধবল বা দুধকুমার, তুলসী গঙ্গা, শিব বরনাই।

শাখা নদী ঃ ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা।

৪। কর্ণফুলি ঃ আসামের লুসাই পাহাড়ের লুগলেহ অঞ্চল থেকে এসেছে তুই চাং এবং বাংলাদেশ-মায়ানমার (বার্মা) সীমান্ত থেকে তুইলিয়াং পুই। এই দুই নদী মিশেছে পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার কাছে মিজোরাম সীমান্তের দেমাগিরিতে। এই মিলিত ধারা কর্ণফুলি নদী নামে খ্যাত।

উপনদী ঃ চেঙ্গী, কাসলং, মাইনী, রাখিয়াং, হালদা, কাপ্তাই, ইছামতী, শিলক, বোয়ালখালি, শ্রীমাই।

পুর্বতন জেলাভিত্তিক নদ-নদীগুলির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো (রহমান ২০০০ এবং বাংলা পিডিয়া ২০০৪) রংপুর (২৬টি), দিনাজপুর (১৮টি), রাজশাহী (১০টি), পাবনা (৮টি), বগুড়া (৭টি), ঢাকা (১৯টি), ময়মনসিং (৩৫টি), সিলেট (৩৬ টি), কুমিল্লা (৪৪টি), নোয়াখালি (১৯টি), চট্টগ্রাম (৩২টি), কুষ্টিয়া (৪টি), যশোহর (২৮টি), ফরিদপুর (৫টি), খুলনা (৬৮টি), বরিশাল (৬১টি) সহ মোট ৪১৯ টি। এছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন খাল ও নদীমালা এর মোট সংখ্যা ১৭৮ টি।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নদীসমূহ

ভারত, মায়ানমার (বার্মা), নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত মোট ৫১টি নদী রয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্র (২,৮৫০ কি. মি.) ২২তম বৃহত্তর নদী এবং গঙ্গা (২,৫১০ কি. মি.) ৩০ তম বৃহত্তর নদী।

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদী কয়টি?

১০.১.২ ঃ নদীসৃষ্ট ভূমিরূপ

১। পদ্মা নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ

যে নদী হিমালয় পর্বতমালার গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে প্রবেশ করেছে, তার নাম গঙ্গা। এ নদী ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিম বঙ্গের সুতী নামক স্থানে রাজশাহী জেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পদ্মা বাংলাদেশের ৩৪,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিধৌত করেছে। মহানন্দা -এর প্রধান উপনদী এবং মাথাভাংগা, বড়াল, গড়াই, মধুমতি ও আড়িয়াল-খাঁ প্রধান শাখা নদী। এই শাখা নদীগুলো থেকে অগণিত ছোট ছোট শাখানদী বের হয়েছে। ছোট ছোট নদীগুলোর মাধ্যমে এ অঞ্চলে গঠিত ভূমিরূপের নাম "মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ" (Moribund Delta)।

মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

২। ব্রহ্মপুত্র নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ

ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতের মানব সরোবর থেকে উৎপন্ন। তিব্বতে এর নাম সংপো এবং ডিহং নামে এটা আসামের উত্তর-পূর্ব কোন দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। অতঃপর ব্রহ্মপুত্র নামে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রংপুর জেলার কুড়ি গ্রামের মাজহিয়ালীতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। পরবর্তীতে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ-পূর্বে বেঁকে ভৈরব বাজারের কাছে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ স্থানের নাম পুরাতন ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের ৫০,৫০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিধৌত করেছে। ১৭৮৭ সালে তিস্তায় প্রবল বন্যার ফলে গতিপথ পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে দিয়ে জোই নামে একটি ক্ষুদ্র শাখা নদীর উপর গিয়ে পড়ে। ফলে নদীটি সম্প্রসারিত হয়ে বৃহৎ আকার ধারণ করে বর্তমানে যমুনা নামে পরিচিত। যা চরযুক্ত বিভিন্ন প্রকার সমভূমি গঠন করেছে।

৩। মেঘনা নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ

আসামের বরাক নদী নাগা-মনিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। কালনী, সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল ২৯,৭৮৫ বর্গ কিলোমিটার। মনু, বাউনাই, তিতাস, গোমতী মেঘনার উপনদী। মধুপুর চত্বর এলাকা ছাড়া মেঘনার সমগ্র উপত্যকাই বর্ষার সময় প্লাবিত হয় এবং নুতন পলি জমার মাধ্যমে প্লাবণ সমভূমি গঠন করেছে।

মেঘনা বিধৌত অঞ্চল কত বর্গ কিলোমিটার?

৪। কর্ণফুলী নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ

লুসাই পাহাড়ের লাংলেহ নামক স্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের দেমাগিরি, বরকল এবং রাঙামাটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চন্দ্রঘোনার কাছে সমতল অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। অতঃপর পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হয়ে নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। এ নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে।

অর্থাৎ সমভূমি গঠনে বাংলাদেশের নদ-নদীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০.১.৩ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব

পূর্বেই বলেছি বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। জালের মত ছড়িয়ে থাকা এ দেশের নদী, উপনদী, শাখা নদী দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন ভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিমিত বন্যায় দেশে উন্নয়ন হয়, আর অধিক বন্যায় দেশে অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেংগে যায়-যেমন ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং এবার ২০০৪ এর বন্যা। বিভিন্ন ধরণের পণ্য ও যাত্রী পরিবহন, প্রত্যন্ত স্থানগুলোর সাথে যোগাযোগ, নির্মল পানি সরবরাহ, কৃষি জমিতে পলি সরবরাহ, কৃষি জমিতে পানি সেচ, মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি, পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সামুদ্রিক বন্দরে পণ্য জোগান এবং আমদানি পণ্যের সুষ্ঠু বন্টন, প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাজে এ দেশের নদীগুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব নিম্নে দেওয়া হলো।

১। **যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ঃ** পরিবহন ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ভিতর নৌ-পথ অন্যতম। ভারী মালপত্র প্রধানতঃ নৌপথেই পরিবহন হয়ে থাকে। যেখানে রেল ও সড়ক যোগাযোগ নেই বা অপ্রতুল, সেখানে যাত্রীসহ বিভিন্ন কৃষিজ, বনজ, খনিজ, শিল্পজাত পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে এই নদী পথ। আবার নদীপথে যাত্রী ও পণ্য সরবরাহ কম খরচে হয়ে থাকে।

২। **নদীর বহুমুখি ব্যবহার ঃ** গ্রাম বাংলার মানুষ নদীর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। খাবার পানি , রান্না, গৃহস্থলির কাজ, গোসল, কাপড় ধোয়াসহ, বিভিন্ন কাজের জন্য নদীর পানির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া সেচের ৪০ শতাংশ নির্ভর করে নদী বা খালের পানির উপর। বন্যার পানি কৃষি জমিতে আসলে সেখানে পলি পড়ে এবং কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে ও কৃষি পণ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়।

৩। **মাছ উৎপাদন ঃ** নদী ও খালগুলোতে প্রচুর মাছ উৎপাদন হয়। এর ভেতর ইলিশ, রুই, কাতলা, চিতল, সিং, মাগুর, কই সহ বিভিন্ন জাতের মাছ দেশের আভ্যন্তরীণ প্রোটিনের চাহিদা অনেকাংশেই মিটায় এবং কিছু মাছ বিদেশেও রপ্তানি হয় এবং তা থেকে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

৪। **বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব ঃ** নদী-খাল বিধৌত জমিতে পলি পড়ে কৃষি জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায়, তার ফলে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এসব দ্রব্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন সম্ভব হয়।

৫। **পানীয় জল ও শিল্পের উপর প্রভাব ঃ** শহরে পানীয় জলের প্রধান উৎস নদ-নদীর পানি। এছাড়াও বহু শিল্পের জন্য যে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয় তাও এই নদ-নদী হতে সরবরাহ হয়ে থাকে।

৬। **জল বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ** কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ দেশের কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এছাড়াও আরও কিছু নদীতে বাঁধ দিয়ে জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করা সম্ভব। এ থেকে দেশের গৃহে, কৃষিতে ও শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৭। **বাণিজ্যের উপর প্রভাব ঃ** নদীপথ হচ্ছে সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা। নদীপথের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ নদী-বন্দর এবং সামুদ্রিক বন্দরে কম খরচে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এছাড়া পণ্য যানবাহনে পুনঃ পুনঃ উঠানো নামানোর ঝামেলা থেকে ব্যবসায়ীগণ রক্ষা পান। বিদেশ থেকে আমদানী কৃত দ্রব্যও দেশের দূর-দূরান্তরে কম খরচে ও ঝামেলা বিহীন ভাবে প্রেরণ সম্ভব।

সুতরাং উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে এতটুকু স্পষ্ট যে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, সেচ সহ আরও বিবিধ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নদীর প্রভাব অপরিসীম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব কিরূপ?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

শূন্যস্থান পূরণ

১। বাংলাদেশে নদী সংখ্যা _________ টি।

২। বাংলাদেশে মোট ১১৭টি নদী রয়েছে।

৩। ___________ নদী ভৈরব বাজারের কাছে মেঘনায় মিলিত হয়েছে।

৪। শহরে পানীয় জলের প্রধান উৎস _________ ।

উত্তরঃ ১। ৭০০ ২। শাখা ৩। ব্রহ্মপুত্র ৪। নদী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মেঘনা নদীর কয়টি উপনদী আছে এবং কি কি?

২। যমুনা নদীর গতিপথ লিখুন

৩। কর্ণফুলী নদীর উপনদীগুলোর নাম লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রধান চারটি নদী কি কি? এগুলোর গতিপথ লিখুন।

২। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব বর্ণনা করুন।

পাঠ-১০.২ ঃ বিভিন্ন প্রকার সেচ ও বহুমুখী প্রকল্প ঃ অবস্থান ও কার্যকারিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বিভিন্ন প্রকার সেচ ও বহুমূখী প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ বাংলাদেশের পানি সম্পদের উপর ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব জানতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশে বন্যার কারণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

বাংলাদেশে পানিসেচ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। অঞ্চল ভেদে সহজলভ্য পানি ব্যবস্থার উপর এবং পানির উৎসের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের সেচ পদ্ধতি বিভিন্ন স্থানে অবলম্বন করা হয়। সাধারণতঃ যে সকল স্থানে নদী রয়েছে এবং সারা বছর নদীতে পর্যাপ্ত পানি থাকে, সে সব এলাকায় কৃত্রিম উপায়ে পানি সেচ করা হয়। আবার অনেক এলাকায় খাল, বিল ও পুকুর থেকে কৃষি ভূমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে পানিসেচের জন্য এখনও বহুল পরিমাণে সনাতন আমলের পদ্ধতিতে পানিসেচ করা হয়। বর্তমানে কোন কোন স্থানে আধুনিক পদ্ধতিতে পানিসেচ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নিচে এ দেশের পানিসেচের বিভিন্ন পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলঃ যার থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার সেচ ব্যবস্থা দেখা যাবেঃ

(ক) সনাতন সেচ পদ্ধতি

আদিকাল হতে কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে যে সেচ পদ্ধতি চালু আছে, তাকে সনাতন সেচ পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৪.৬০ লক্ষ একর জমিতে পানি সেচ করা হয়। তবে পূর্বে এ পদ্ধতি অধিক প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের সনাতন সেচ পদ্ধতির বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

(১) দোন পদ্ধতি ঃ এটি এক ধরনের প্রাচীন পানি সেচ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কাঠের তৈরি দোন বা ডোঙ্গার সাহায্যে শস্যক্ষেতের নিকটবর্তী নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ইত্যাদি হতে কৃষিক্ষেতে পানিসেচ করা হয়।

(২) চাই দোলানো পদ্ধতি ঃ এটি একটি প্রাচীন ধরনের সেচ পদ্ধতি। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে টিনের বা কাঠের তিন কোণা চাই দ্বারা শস্যক্ষেতের নিকটবর্তী নদনদী, খালবিল, পুকুর ডোবা হতে পানি সেচ করা হয়। ৩০ বছর পূর্বেও এ পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

(৩) অন্যান্য পদ্ধতি ঃ উপরিউক্ত প্রাচীন পানিসেচ পদ্ধতি দু'টি ছাড়াও শস্যক্ষেতের নিকটবর্তী জলাশয় হতে কলসি, বালতি, টিন, ঘটি, বাটি ইত্যাদির সাহায্যেও পানিসেচ করা হয়। বৃহত্তম রাজশাহী ও বগুড়া জেলার বরেন্দ্র অঞ্চল এবং রংপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের সেচকার্যে এরূপ দেশীয় সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া হতো।

বাংলাদেশের প্রধান দুইটি সেচ পদ্ধতি কি কি?

বিভিন্ন সেচ পদ্ধতিতে সেচকৃত জমির পরিমাণ*
(লক্ষ একর হিসেবে)

সেচ পদ্ধতি	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
ক. আধুনিক পদ্ধতি		
১. শক্তিচালিত পাম্প	১৪.০৪	১৪.০৯
২. নলকূপ (মোট) ঃ	৬৪.১২	৬৬.০১
(র) হস্তচালিত নলকূপ	১.২৬	০.৯৩
(রর) গভীর নলকূপ	১৩.৩৪	১১.৭৩
(ররর) অগভীর নলকূপ	৪৯.৫২	৫৩.৩৫
৩. খাল	৮.৭৭	৮.৮৫
খ. সনাতন পদ্ধতি (দোন, ঝুড়ি, দোলানো ইত্যাদি)	৫.১২	৪.৬০
সর্বমোট	**৯২.০৫**	**৯৩.৫৫**

* **উৎসঃ** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জুন-১৯৯৮; পৃঃ ৩৮

(খ) আধুনিক সেচ পদ্ধতি

বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের দ্বারা ব্যাপকভাবে যে সেচকার্য করা হয় তাকে আধুনিক সেচ পদ্ধতি বলে। বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে এ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য হয় বটে, কিন্তু বাংলাদেশে এটি তেমন প্রসার লাভ করেনি। নিচে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার বিবরণ দেয়া হলঃ

১। শক্তি চালিত পাম্প ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে পানিসেচের কাজে শক্তিচালিত পাম্প বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে পাম্পের সাহায্যে নদনদী, খালবিল, পুকুর ডোবা, হাওর-বাঁওড় প্রভৃতি হতে কৃষিক্ষেত্রে পানিসেচ করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৮,৬০০ টি শক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে প্রায় ১৭.৪৫ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচ দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী জেলায় সবচেয়ে বেশি পানিসেচ করা হয়।

২। নলকূপ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানিসেচ করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ সালে এ পদ্ধতির মাধ্যমে এদেশে প্রায় ৬৬.০১ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচ করা হয়। সাধারণত তিন ধরনের নলকূপ দ্বারা পানিসেচ করা হয় বলে একে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমনঃ

(i) হস্তচালিত নলকূপ

(ii) গভীর নলকূপ

(iii) অগভীর নলকূপ

(i) হস্তচালিত নলকূপ ঃ বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে ভূ-গর্ভের সামান্য নিচে পানি পাওয়া যায় সেসব স্থানে হস্ত বা পা-চালিত নলকূপের মাধ্যমে পানিসেচ করা হয়। এ ব্যবস্থায় পানিসেচ স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পানিসেচ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এ পদ্ধতিতে বার্ষিক প্রায় ৯৩ হাজার একর জমিতে পানিসেচ করা হয়।

(ii) অগভীর নলকূপ ঃ বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে শক্তিচালিত পাম্পের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে পানি পাওয়া যায় না অথচ ভূ-গর্ভের সামান্য নিচে পানি থাকে, সেসব অঞ্চলে অগভীর নলকূপের সাহায্যে পানিসেচ করা যায়। এর সাহায্যে দৈনিক ১৫ হতে ৩০ একর পর্যন্ত জমিতে পানিসেচ করা যায়। ১৯৯৬-৯৭ সালে অগভীর নলকূপের সাহায্যে বাংলাদেশে প্রায় ৫৩ লক্ষ ৩৫ হাজার একক জমিতে পানিসেচ করা হয়।

(iii) গভীর নলকূপ ঃ বাংলাদেশের যে সমস্ত স্থানে খাল-বিল ও নদী-নালা কম এবং ভূ-গর্ভে পানির স্তর অনেক নিচে সেসব স্থানে গভীর নলকূপের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পানিসেচ করা হয়। এ কারণে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশেষ করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়ায় গভীর নলকূপের প্রচলন খুব বেশি। এছাড়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ, পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলেও এ পদ্ধতিতে পানিসেচ করা হয়। একটি গভীর নলকূপ প্রতিদিন প্রায় ৯০ একর জমিতে পানিসেচ করতে পারে। অবশ্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সরকারী উদ্যোগে অথবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে গভীর নলকূপ বসানো হয়। এটি ডিজেল অথবা বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চালানো হয়। ১৯৯৬-৯৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে সর্বমোট ১৮,৪৮০ টি গভীর নলকূপের সাহায্যে ১১ লক্ষ ৭৩ হাজার একর জমিতে পানিসেচ করা হয়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচকৃত জমি-১৯৯৭-৯৮
(লক্ষ একর হিসেবে)

শক্তিচালিত পাম্প	গভীর নলকূপ	অগভীর নলকূপ	হস্তচালিত নলকূপ	খাল	সনাতন পদ্ধতি	সর্বমোট
১৭.৪৫	১১.৭৩	৫৩.৩৫	০.৯৩	৮.৮৫	৪.৬০	৯৩.৫৫

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৮; পৃঃ ৩৮

বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচের আওতায় কত জমি রয়েছে?

৩। খাল পদ্ধতি ঃ বাংলাদেশের বড় বড় সেচ পরিকল্পনাগুলোতে খালের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। প্রথমে প্রধান খালটি পানিতে পূর্ণ করা হয় এবং তা হতে প্রয়োজন অনুযায়ী শাখা খালগুলো দ্বারা কৃষিক্ষেতে পানি দেয়া হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে কোন কোন সময় খালগুলোর উভয় পার্শ্বের জমিতে পানি জমে ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে প্রধান খালের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি নদীতে প্রেরণ করার ব্যবস্থাও আছে। সাধারণত: তিন প্রকার খালের দ্বারা পানিসেচ করা হয়; যথা-নিত্যবহ খাল, প্লাবন খাল ও সঞ্চিত খাল। কিন্তু আমাদের দেশে দু'প্রকার খাল দেখা যায়। যথা-নিত্যবহ খাল ও সঞ্চিত খাল। এ পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ ৮৫ হাজার একর জমিতে পানিসেচ করা হয়।

খাল পদ্ধতিতে কত একর জমিতে সেচ দেয়া হয়?

(ক) নিত্যবহ ঃ এ সমস্ত খাল এমনভাবে খনন করা হয় যেন সারা বছরই এদের মধ্যে নদীর পানি আসতে পারে। এ পদ্ধতিতে নদীর ওপর কৃত্রিম বাঁধ থাকে এবং উজান অঞ্চলে পানি সঞ্চিত হয়। ফলে নদীর উভয় তীরের কৃত্রিম খালগুলো দ্বারা পানি স্বাভাবিকভাবেই কৃষিক্ষেতে যেতে পারে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী সেচ পরিকল্পনায় এরূপে পানিসেচ করা হয়। বাংলাদেশের আরও অনেক সেচ পরিকল্পনা কেন্দ্রে এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

(খ) সঞ্চিত খাল ঃ বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে সেচ কেন্দ্রের প্রধান খালে পানি সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা থাকে। এরূপ খালকে সঞ্চিত বা জলাধার খাল বলে। পরে প্রয়োজন অনুসারে শাখা খালের মাধ্যমে পানি শস্যক্ষেতে সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেচ পরিকল্পনা কেন্দ্রে এরূপ খাল দেখা যায়।

১০.২.১ বাংলাদেশের বহুমুখী সেচ প্রকল্প (Irrigation Projects of Bangladesh)

বাংলাদেশের সর্বত্র বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এখানে পানিসেচের বেশি প্রয়োজন হয় না। শীতকালে এখানে বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে। ফলে শীতকালীন ফসলের জন্য শীতকালে বাংলাদেশে পানিসেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও অনিয়মিততার দরুন অনেক সময় পানিসেচের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন কোন বছর অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যাও দেখা দেয়। এছাড়া, সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে জোয়ারের লোনা পানি আসায় বহু ফসল নষ্ট হয়। এ কারণেই বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিকল্পনাই বহুমুখী। অনেকগুলো পরিকল্পনা একই সঙ্গে পানিসেচ কার্যে সহায়তা করে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং জলপথের উন্নয়ন সাধন করে। নিচে কতিপয় বহুমুখী পরিকল্পনা আলোচনা করা হলঃ

১। **গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা ঃ** তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত এ পরিকল্পনা অনুযায়ী কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারার নিকট পদ্মানদী হতে পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে অনেকগুলো খালের মাধ্যমে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিজমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। এর উদ্দেশ্য হল পানিসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন। এ পরিকল্পনায় অত্র এলাকার ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে পানি সেচের মাধ্যমে ৮৪ হাজার টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং প্রচুর রবিশস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

এ পরিকল্পনাটির সফল বাস্তবায়নের জন্য একে তিনটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা ইউনিট।

এক নম্বর কুষ্টিয়া ইউনিটের বাস্তবায়নের কাজ ১৯৭০ সাল নাগাদ শেষ হয়। এতে প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ ইউনিটের অধীনে ২ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দু'নম্বর ইউনিটটি সাবেক কুষ্টিয়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের এবং সাবেক যশোর জেলার উত্তরাংশের প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার এক জমি নিয়ে গঠিত।

তৃতীয় ইউনিটটি সাবেক কুষ্টিয়া জেলার দক্ষিণাংশের এবং সাবেক খুলনা জেলার উত্তরাংশের এক বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত।

প্রথমে প্রতি সেকেন্ডে ১২৫ ঘনফুট পানি সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন ১২ টি পাম্প এবং পরে ১,৩০০ ঘনফুট পানি সরবরাহের ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি পাম্প বসানো হয়েছে। এ পাম্পগুলো পরিচালনার জন্য এখানে ৯ হাজার ২ শ' কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে।

২। **কর্ণফুলী বহুমুখী পরিকল্পনা ঃ** এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। যদিও এটি প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা তবুও এর সাহায্যে কর্ণফুলী নদীর নিম্নাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রায় ৬৪৪ কি. মি. নৌ-চলাচলের সুবন্দোবস্ত এবং দশ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচ করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে খরস্রোতা কর্ণফুলী নদীর ওপর ৪৬ মিটার উচ্চ, ৬৬৪ মিটার দীর্ঘ এবং ২৪২ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাঁধের ফলে ৮০৮ বর্গ কি. মি. আয়তনের একটি কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। এ বাঁধের ফলে চট্টগ্রাম শহর ও শহরতলী এলাকা ভয়াবহ বন্যার কবল হতে রক্ষা পাচ্ছে। এ কৃত্রিম হ্রদের পানি দ্বারা রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে বছরে দু'টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

৩। **তিস্তা বাঁধ পরিকল্পনা ঃ** এ পরিকল্পনা অনুযায়ী রংপুর অঞ্চলের গাদমারী নামক স্থানে তিস্তা নদীর ওপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি কার্যকরী হলে বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলের ১,৮০৫ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা হবে।

৪। **ব্রহ্মপুত্র বহুমুখী পরিকল্পনা ঃ** বর্তমানে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী মৃত প্রায়। তাই এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্রের স্রোত পুনরুজ্জীবিত করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হবে।

৫। **কুমিল্লা চট্টগ্রাম পরিকল্পনা ঃ** এটি একটি বহুমুখী পরিকল্পনা। এর ফলে মেঘনা নদী হতে পানি নিয়ে বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম জেলার প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য করা হবে। এর ফলে নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মধ্যে নৌ-চলাচলের পথও সুগম হবে।

৬। **গোমতী পরিকল্পনা ঃ** এ পরিকল্পনা প্রধানত গোমতীর পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত এলাকায় শীত মৌসুমে সেচ ব্যবস্থায় সাহায্য করবে। এর ফলে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় ৫৮ হাজার ৩শ একর জমির কৃষকেরা উপকৃত হবে।

৭। **ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা সেচ পরিকল্পনা ঃ** এ পরিকল্পনা ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এর পূর্বে শীতলক্ষা নদী, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ শহর, পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা এবং উত্তরে ধোলাইখাল। এ পরিকল্পনাধীন মোট ১৮ হাজার ৮শ ৪০ একর জমির মধ্যে ১৫ হাজার একর জমি চাষাবাদের উপযোগী। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দু'টি; যথা-বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সেচ করা। এ উদ্দেশ্যে প্রতি সেকেন্ডে ১২৭ ঘনফুট পানি তোলার ক্ষমতাবিশিষ্ট ৪টি পাম্প বসানো এবং ৭ মাইল লম্বা প্রধান সেচ খালের নির্মাণ কাজ কয়েক বছর পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে।

৮। **চাঁদপুর সেচ পরিকল্পনা ঃ** এটি কুমিল্লা-চট্টগ্রাম পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। চাঁদপুর পরিকল্পনা উত্তর ও দক্ষিণে দু'ভাগে বিভক্ত। দু'ভাগের মধ্যে রয়েছে ডাকাতিয়া নদী, পশ্চিমে মেঘনা এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ধনাগোদা নদী। চাঁদপুরের মতলব বাজার, হাজীগঞ্জ ও কচুয়া থানার অংশ বিশেষ নিয়ে এ পরিকল্পনার উত্তর ভাগ গঠিত হবে। ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ ও চাঁদপুরের অংশ বিশেষ এবং নোয়াখালি অঞ্চলের সমগ্র রায়পুর এবং রামগঞ্জ থানা ও লক্ষ্মীপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে দক্ষিণ ভাগ গঠিত হয়। এ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে প্রায় ১,৮৭,০০০ একর জমির মালিকগণ উপকৃত হবে।

৯। **রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও দিনাজপুর পরিকল্পনা ঃ** এ পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলের সাবেক চারটি জেলায় ৩৬০ টি নলকূপ ও ৮৬০টি লিফট পাম্পের সাহায্যে মহানন্দা, আত্রাই ও বড়াল নদী হতে পানি নিয়ে প্রায় ২.৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য করা হবে।

১০। **সাবেক মনু নদী পরিকল্পনা ঃ** এ পরিকল্পনার সাহায্যে বৃহত্তর সিলেট জেলায় প্রায় ৬৫ হাজার একর জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হবে।

১১। **ফরিদপুর পরিকল্পনা ঃ** এ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় প্রায় ৩.৭৫ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য সম্ভব হবে। এর সাহায্যে এ জেলার নদী ও খালগুলোর উন্নয়ন করে বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হবে।

১২। **সাঙ্গু পরিকল্পনা ঃ** চট্টগ্রামের সাংগু নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ হতে পাম্পের সাহায্যে প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হবে। এ স্থানে বার্ষিক ২০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এছাড়া, চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

১৩। **টানগু পরিকল্পনা ঃ** এ প্রকল্প অনুযায়ী টানগু ও করতোয়া নদীর মোহনায় বাঁধ নির্মাণ করে খালের সাহায্যে সাবেক দিনাজপুর জেলার প্রায় ১.৫০ লক্ষ একর জমিতে পানি-সেচের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪। **বরিশাল-পটুয়াখালি সেচ প্রকল্প ঃ** সাবেক বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার প্রায় ১.৪৭ লক্ষ একর জমিতে পানিসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য প্রকল্পটি নির্মাণ করা হয়েছে। বরিশাল পরিকল্পনার দ্বারা ৯৬৫ কি. মি. খাল খনন, ২,৫০০ টি হালকা পাম্প বসানো এবং ৭৫০ টি ছোট-বড় স্লুইস গেট নির্মাণ করে এ অঞ্চলে পানিসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন করা হবে।

১৫। **সমুদ্র উপকূলবর্তী বাঁধ ঃ** বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক লোনাপানির প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে যুগের পর যুগ শুধু উপকূলবর্তী জেলাগুলোর মাঠের ফসলই নষ্ট হয়নি নষ্ট হয়েছে সেই সাথে অসংখ্য গৃহপালিত পশু ও মানুষের জান-মাল। তাই সমুদ্র উপকূলবর্তী বাঁধ নির্মাণের প্রধান লক্ষ্য হলঃ

(ক) লোনা পানির প্লাবন হতে চাষযোগ্য জমি রক্ষা।
(খ) জমি হতে লবণ সম্পূর্ণ নিষ্কাশন বা নির্মূল করা।
(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হতে মানুষের জানমাল রক্ষা করা।
(ঘ) পতিত জমি উদ্ধার ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪,৮২৮ কি. মি. দীর্ঘ উপকূলবর্তী বাঁধ এবং প্রায় ৮০০ টি স্লুইস গেট নির্মাণ করা হয়। এসব বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণের ফলে উপকূলবর্তী জেলাসমূহের প্রায় ১৬ লক্ষ একর জমি লোনা পানির আক্রমণ হতে রক্ষা পায়। এ বাঁধের ফলে আবার অনেক নিচু জমি নদী ও সাগর হতে উদ্ধার পেয়েছে। এরূপ উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ সাবেক নোয়াখালি জেলায় সবচেয়ে বেশি। এ জেলায় উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ৫১৮ বর্গ কিলোমিটার।

১০.২.২ বাংলাদেশের পানি সম্পদের ওপর ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব

পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। গঙ্গোত্রী হিমবাহ গঙ্গা নদীর উৎস স্থল। এটি ভারতের উপর দিয়ে প্রায় ১,৬০০ কি. মি. প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশে এ নদী পদ্মা নামে পরিচিত। ভারত তার পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলায় ধুলিয়ানা নামক স্থানে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অদূরে এ বাঁধ অবস্থিত। দু'দেশের সরকারবৃন্দ ১৯৭৫-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত (১৯৮৫ সাল বাদে) বিভিন্ন সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে, বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে ৪৫-৩৮ হাজার কিউসেক পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে।

ফারাক্কা বাঁধের প্রস্তাব

গঙ্গা নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে গঙ্গার পানি হুগলী নদীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করায় পদ্মা ও তার শাখা নদীগুলোতে পানির অভাব দেখা দিয়েছে। এতে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা অচল হবার উপক্রম হচ্ছে। শীতকালে পদ্মা নদীর পানি মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ভেড়ামারার নিকট পদ্মা হতে পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানিসেচ সম্ভব হয় না। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নৌ-চলাচালে প্রতিবন্ধকতা, মৎস্য সম্পদের বিনাশসহ পৃথিবীর বৃহত্তম স্রোতজ বনভূমি সুন্দরবনের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনীতির অপুরনীয় ক্ষতি করছে। যেমন, উত্তরাঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ১০-১২ মিটার নিচে নেমে যাওয়ায় প্রায় ১৬ টি জেলায় অগভীর নলকূপসমূহে সেচের পানির অভাব দেখা দিয়েছে। হস্তচালিত হাজার হাজার নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ায় খাবার পানির অভাব দেখা দিয়েছে। উপরন্ত নলকূপের পানিতে বিষাক্ত আর্সেনিকও পাওয়া যাচ্ছে। দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য ঘটছে। মরু অঞ্চলের মত দিনে প্রচন্ড গরম আবার রাতে শীতের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দেশকে রক্ষার জন্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ ছাড়াও কিছু জুরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। যেমন (১) উজান স্রোতে ফারাক্কার ন্যায় বাঁধ নির্মাণ করে পানি সংরক্ষণ ও পুইস গেট দিয়ে পরিমিত পানির ব্যবস্থা করা,

(২) কৃত্রিম জলাশয় নির্মাণ করা এবং

(৩) খাল খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রমকে জোরালো করা।

তবে ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানি যাতে ভারত ও বাংলাদেশ সমভাবে ব্যবহার করতে পারে, এর জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ফারাক্কার প্রভাব কিরূপ?

১০.২.৩ বাংলাদেশের বন্যার কারণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

বন্যা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে পানির উচ্চ প্রবাহ, যা কোন নদীর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম তীর অতিক্রম করে ধাবিত হয়। তীর ছাড়িয়া পানি আশপাশের সমভূমি প্লাবিত করলে সাধারণত জনগণের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাড়ায়, নদীর পানি প্রবাহের এরূপ অবস্থাকে বন্যা বা প্লাবণ বলে (বাংলাপিড়িয়া, খন্ড-৬)। যদিও বাংলাদেশে বন্যার সংগা স্বতন্ত্র। বর্ষাকালে যখন নদী, খাল, বিল, হাওড় ও নিচু এলাকা ছাড়িয়ে সমস্ত জনপদ পানিতে ডুবে যায় এবং ফসল ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ যে সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে তখন তাকে বন্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যার সঙ্গে ফসলের একটা সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে দেখা যায়, যাতে বৃষ্টিপাতের অবদানই সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত উত্তর পূর্বাঞ্চলে সর্বোচ্চ ৫৬৯০ মিলিমিটার থেকে সর্ব পশ্চিম প্রান্তে ১১১০ মিলিমিটারের মত। গড় বৃষ্টিপাত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৮২০ মিলিমিটার, উত্তর পূর্বাঞ্চলে ২৮৩০ মিলিমিটার, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ২৬৯০ মিলিমিটার। ৩০ বছরের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড থেকে দেশের গড় বৃষ্টিপাত হিসাব করা হয়েছে ২৩২০ মিলিমিটার। ভারতে গঙ্গা অববাহিকায় গড় বৃষ্টিপাত ৬০০-২৮০০ ও ১০০০-২৫০০ মিলিমিটারের মত। যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্ষা মৌসুমেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানি নদীগুলি দিয়ে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী অববাহিকায় প্রায় বছরই বন্যা দেখা দেয়। বন্যার পানির ৮০

শতাংশের বেশী আসে উজানে অবস্থিত অববাহিকভূক্ত দেশগুলো হতে। বাকী প্রবাহ স্থানীয় বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ২৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল অর্থাৎ ১৮ শতাংশ ভূ-খন্ড বন্যা কবলিত হয়। ব্যাপকভাবে বন্যা হলে সমগ্র দেশের ৫৫ শতাংশের অধিক ভূ-খন্ড বন্যার প্রকোপে পড়ে। যেমন এবার (২০০৪ সন) জুলাই মাসের বন্যা। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মাঝে ৪৩টি জেলাই সম্পূর্ণভাবে পানির নিচে চলে যায়। অর্থাৎ মোট ভূমির প্রায় ৬০ শতাংশ পানি দ্বারা প্লাবিত হয়। প্রতি বছর গড়ে বাংলাদেশে তিনটি প্রধান নদী পথে মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আর্দ্র মৌসুমে ৮৪৪,০০০ মিলিয়ন কিউসিক মিটার পানি প্রবাহিত হয়। বাৎসরিক মোট প্রবাহের এটি ৯৫ শতাংশ। সে তুলনায় একই সময় দেশের অভ্যন্তরে ১৮৭,০০০ মিলিয়ন কিউসিক মিটার নদী প্রবাহ সৃষ্টি হয় বৃষ্টিজনিত কারণে। এখানে উল্লেখ্য যে, মোট প্রবাহের ৯০ শতাংশ পানি আসে দেশের বাইরে থেকে।

বন্যার কারণ

বাংলাদেশে বন্যার প্রধান কারণ এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং দেশের সমতল চরিত্র। বাংলাদেশের উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অঞ্চল বিধায় মৌসুমী বায়ু এই অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। দক্ষিণ হিমালয় এবং ভারতের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঢাল বাংলাদেশের আবাসিক অঞ্চলের পানি বাংলাদেশের উপর দিয়ে ১.৭৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার অববাহিকা অঞ্চলের পানি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মেশে এবং এই বিচিত্র চরিত্রের জন্যই বাংলাদেশে প্রায়ই বন্যা হয়।

বাংলাদেশে বন্যার কারণ সমূহ কি কি?

বৃষ্টিপাত ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা নীচের বিষয়গুলিকে বন্যার কারণ হিসেবে দায়ী করেছেনঃ

১। **বন উজাড় (Deforestation)** ঃ বন উজাড়ের ফলে অববাহিকা অঞ্চলের ভাটির দিকে পানি প্রবাহকে তরান্বিত করে ও নদী ও অন্যান্য প্রবাহবাহী চ্যানেল পলি দিয়ে ভরাট করতে সহায়তা করে। এর ফলে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা অববাহিকায় বন্যার প্রকোপ বাড়ছে (জড়মবৎ, ১৯৮৯)। ভূ-তাত্ত্বিক সময়কাল ধরে গঙ্গা অববাহিকায় ২০০০ মিটারেরও বেশী গভীরতা ভরাট হয়েছে পলল অবক্ষেপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

২। **উজানে নদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (Upstream River Training Works)** ঃ উজানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকায় ভারত বিভিন্ন ধরণের নদী প্রশিক্ষণ ও দিক পরিবর্তন (direction) বিষয়ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে। উজানে নদী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যা প্রান্তরে পানির অনুপ্রবেশ ব্যাহত হবার কারণে নদীতে পানি প্রবাহ বেড়ে যাওয়ার ফলে ভাটিতে বন্যার উচ্চতা বেড়ে যায়। ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

৩। **ভূ-কম্পন (Earthquakes)** ঃ ভূ-কম্পনের ফলে নদীর গতি পরিবর্তন বা তলদেশ উচুঁ হয়ে যেতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল ব্রহ্মপুত্র নদীর বেলায়। ১৭৮৭ সালের ভূ-কম্পনে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান গতিপথ লাভ করে (Sharma, 1983)

৪। **আবহাওয়ার পরিবর্তন (Climate Change)** ঃ অনেকে মনে করেন যে, আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে। শুকনো মৌসুমে আবহাওয়ার প্রকৃতি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কিছুটা বদলে গেলেও বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাতের প্যাটার্ন বাংলাদেশে তেমন বদলায়নি।

৫। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস;

৬। বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার তীব্রতা;

৭। বর্ষা মৌসুমে সাগর পৃষ্ঠের প্রায় ০. ৫-১.০ মিঃ উত্থান;

৮। দেশের অভ্যন্তরে অপরিকল্পিত বাঁধ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট;

৯। খাল ভরাট করে বাড়ী ও রাস্তাঘাট তৈরী করা;

১০। খাল ভরাট করে বাড়ী ব-দ্বীপ এলাকার পলি সমূহের নিজস্ব চাপ এবং ভূ-ত্বকের নীচে টেকটোনিক ক্রিয়ার ফলে উক্ত এলাকার ভূ-পৃষ্ঠের ক্রম অবনমন (gradual subsidence)।
১১। বঙ্গোপসাগরের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বেশী নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়া।
১২। নদীর তলদেশের ক্রমোন্নতি।
১৩। উজানের বরফগলা পানি;
১৪। আঁকাবাঁকা নদী।

কি কি কারণে বাংলাদেশে বন্যা হয়?

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

বন্যার কারণের উপর নির্ভর করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার কিছু সুপারিশ মালা নীচে দেওয়া হলোঃ

১। বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ

বন্যা পূর্বাভাস ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল কেন্দ্রে বন্যা সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তা শুধু মাত্র ১০ শতাংশ অববাহিকা অঞ্চল কভার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাকী অঞ্চল প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণের বাইরে থাকছে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর উৎস দেশের বাইরে বিশেষতঃ ভারতীয় অঞ্চলে সুতরাং পূর্বাভাস প্রদানের জন্য দীর্ঘ সময় পূর্বে জনসাধারণকে সতর্ক করার জন্য উজান অঞ্চলে উপাত্ত নিয়মিত পাওয়া প্রয়োজন। তবে দূর-অনুধাবণ উপাত্ত বিশাল অববাহিকা জুড়ে বৃষ্টিপাত, বরফগলন এবং বন্যা প্রান্তরের প্লাবন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম।

দেশের ভিতরে ৩৫ টি কেন্দ্রে পানির লেভেল এবং ৩৪ টি কেন্দ্র থেকে বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। ৪০টি কেন্দ্রের ওয়ারলেস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উপাত্ত সঞ্চালন করা হয়ে থাকে। বন্যার সময় রাষ্ট্রায়ত্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। যে পরিমাণ উপাত্ত পাঠানো হয় তা বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট নয় (UNDP, 1989)।

বন্যার পূর্বাভাস বলতে কি বুঝ?

বন্যা সতর্কীকরণ

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কম হবার জন্য বন্যা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকারী বন্যা সতর্কীকরণ যে ব্যবস্থা রয়েছে তা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের জন্য উপাত্ত নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যক। এরজন্য পুরো হাইড্রো-মেটিয়োরোলজিক্যাল (hydro-meteorological) ব্যবস্থাকে টেলিসেন্ট্রিক নেটওয়ার্কে পরিণত করা প্রয়োজন।

বন্যা প্রস্তুতি ঃ কার্যকর বন্যা প্রস্তুতির জন্য শক্তিশালী অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন-

- সতর্কীকরণ;
- লোকজন সরানো এবং আশ্রয় প্রদান;
- বন্যা মোকাবেলায় এবং
- জরুরী প্রতিক্রিয়া (response) সংগঠন করা।

২। বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

বন্যা নিয়ন্ত্রনের নানা ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে একেক ধরণের পদ্ধতি কোন নির্দিষ্ট স্থানের জন্য প্রযোজ্য। কারণ তা নির্ভর করে বন্যার ধরণ, স্থায়িত্বকাল, জনবসতির ঘনত্ব, ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইত্যাদির উপর। বন্যা নিয়ন্ত্রণের সচরাচর যে সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক) বাঁধ (Embankment) ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে পুরানো পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নদীর দু'তীর বরাবর স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মাটি দিয়ে বাঁধ তৈরী করা হয় যাতে করে পানি অববাহিকার এলাকায় প্রবেশ করতে বা প্রবেশ করে প্লাবিত করতে না পারে।

খ) জলাধার (Dam) ঃ জলাধারের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নাব্যতা, সেচ, পানি সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহ বহুমুখী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। জলাধারে অন্তঃপ্রবাহ ও নিয়ন্ত্রণের পূর্বাভাস নিশ্চিত হলেই বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব।

গ) নদীখাত উন্নয়ন (Channel Improvement) ঃ বন্যার সর্বোচ্চ প্রবাহকে বিপদমুক্ত স্তরে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যে নদীর প্রবাহ পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদীখাত ভাল ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ) জরুরী বন্যা নির্গমন পথ (Emergency Floods Ways) ঃ নদীবক্ষ হতে অতিরিক্ত পানি বিভিন্ন নির্গমণ পথ দিয়ে সরিয়ে ফেলার মাধ্যমে বন্যার প্রকোপ কমানো যায়। এই জরুরী ব্যবস্থাকেই বন্যা নির্গমন পদ্ধতি বলে। বন্যার প্রকোপ কমাতে এটা একটা ভাল ব্যবস্থা।

ঙ) আন্তঃঅববাহিকা স্থানান্তর (Interbasin Transfer) ঃ আন্তঃঅববাহিকা স্থানান্তর হলো এক নদীর খাত হতে অন্য নদীর খাতে প্রবাহ স্থানান্তর করা।

চ) মাটি ও পানি সংরক্ষণ (Soil and Water Conservation) ঃ বন উজাড়ের ফলে ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং নদীতে পলি প্রবাহ বাড়ে। উজান এলাকার ভূমি ক্ষয় ছাড়াও বাংলাদেশের নদীগুলির পাড় ভেঙে প্রচুর পরিমাণ মাটি নদীতে মিশছে। বিশেষ করে মেঘনা এবং ব্রক্ষ্মপুত্রে। সুতরাং মাটি ও পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Regional Cooperation and Flood Control) ঃ গঙ্গা, ব্রক্ষ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল ও চীনে (তিব্বত) অবস্থিত। এই দেশগুলোর বন্যাসহ অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনা সমস্যা এক এক ধরণের। সুতরাং এই দেশগুলোর বন্যা সমস্যাকে সমাধানের জন্য একত্রে বসে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা সম্ভব।

খাল ও নর্দমা কাটা (Canal Digging) ঃ স্থল ভাগ হতে বৃষ্টির পানি যাতে দ্রুত নদীতে নেমে যেতে পারে তার জন্য নিষ্কাশন, নিয়মিত খাল ও নর্দমা খনন করা যেতে পারে।

খাল পুনঃখনন (Reexcavation of Canal) ঃ বাংলাদেশের অসংখ্য খাল সংস্কারের অভাবে মজে গেছে। এ সকল খাল পুনঃখননের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

রেল ও সড়ক নির্মাণে সতর্কতা অবলম্বন (Precaution for Rail and Road Construction) ঃ রেল ও সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক রাখতে হবে যাতে পানি নিষ্কাশনের পথে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি না হয়। প্রয়োজনে জলপথের উপর বাঁধ না দিয়ে পুল বা সেতু নির্মাণ করে জল প্রবাহ ঠিক রাখতে হবে। যা হোক উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি কি?

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে ছোট বড় ৭০০ নদী আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাংলাদেশের নদীনালাকে চারটি নদী প্রণালীতে বিভক্ত করা যায়। (১) গঙ্গা নদী প্রণালী, (২) ব্রক্ষ্মপুত্র-যমুনা নদী প্রণালী (৩) মেঘনা নদী প্রণালী এবং (৪)দক্ষিণ-পূর্বাংশের নদী প্রণালী। পদ্মায় বাংলাদেশের ৩৪,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এবং ব্রক্ষ্মপুত্র ৫০,৫০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিধৌত করেছে। অপর দিকে মেঘনা বিধৌত করেছে ২৯,৭৮৫ বর্গ

কিলোমিটার প্রায় সব নদীই তার মোহনায় সমতল ভূমি ও ব-দ্বীপ গঠন করেছে। নৌ-যোগাযোগ সবচেয়ে কম খরচের এবং এজন্য বাংলাদেশের ভারী মাল পরিবহণ নদী পথে হয়ে থাকে। এদেশের অর্থনীতিতে নদীর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। বাংলাদেশে সনাতন ও আধুনিক উভয় প্রকার সেচ ব্যবস্থা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে সর্বমোট কতটি নদী আছে?

ক) ৭০০ টি খ) ৭০০০ টি
গ) ৩ টি ঘ) ৪ টি

২। বাংলাদেশের নদী নালাকে কয়টি নদী প্রণালীতে বিভক্ত করা যায়?

ক) ৪ টি খ) ১ টি
গ) ২ টি ঘ) ৩ টি

৩। ফারাক্কা বাঁধের অবস্থান কোথায়?

ক) উত্তর প্রদেশে খ) পশ্চিম বঙ্গে
গ) নেপালে ঘ) বাংলাদেশে

৪। হুগলী নদীর অবস্থান কোথায়?

ক) চাপাই নবাবগঞ্জ খ) পশ্চিম বঙ্গে
গ) উত্তর প্রদেশে ঘ) একটিও সঠিক নয়

৫। বাংলাদেশে প্রধানত কত প্রকার সেচ পদ্ধতি রয়েছে?

ক) ১ প্রকার খ) ২ প্রকার
গ) ৩ প্রকার ঘ) ৪ প্রকার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের বন্যার কারণগুলি কি কি?
২. বাংলাদেশের সনাতন পদ্ধতিতে সেচের ব্যবস্থা সমূহ কি কি?
৩. বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে লিখুন।
৪. বাংলাদেশের মৃত প্রায় ব-দ্বীপ কোথায়?
৫. বাংলাদেশের পানি সম্পদের উপর ফারাক্কার প্রভাব সংক্ষেপে লিখুন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন প্রকার সেচ পদ্ধতির বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশের পানি সম্পদের উপর ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব লিখুন।
৩. বাংলাদেশের বন্যার কারণ ও বন্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।